মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে মানবিক মুখ

ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়

অসুস্থ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতা লিখেছিলেন এপ্রিল ১৭, ১৯৪৭ তারিখে। কবিতাটি প্রকাশের জন্য তিনি 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় জমা দিয়েছিলেন। এরপর দৈনিক স্বাধীনতার মে ৪, ১৯৪৭ তারিখের (রবিবার) সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। অসুস্থ কবি সুকান্তকে নিয়ে মানিকের কবিতাটি রচিত হওয়ার সতেরো দিনের মাথায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শিরোনাম-ই ছিল 'সুকান্ত ভট্টাচার্য'। এই কবিতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ

তোমার বুক কুরে কুরে খাচ্ছে টি-বি কীট।
দুর্যোগের ঘনকালো মেঘ ছিঁড়ে কেটে
আমরা রোদ এনে দেবো ছেলেটার গায়ে,
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।

চাঁদা তুলে টি-বি'র কীট মেরে কবি সুকান্তকে বাঁচিয়ে তুলতে সমর্থ হননি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরা। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার মাত্র নয় দিনের মাথায় মে ১৩, ১৯৪৭ তারিখে, মঙ্গলবার প্রয়াত হন কবি সুকান্ত।

কবি সুকান্ত প্রয়াত হওয়ার নয় বছর পর ডিসেম্বর ৩, ১৯৫৬ তারিখে প্রয়াত হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। পুরো পঞ্চাশটা বছরও মানিক পাননি ওই পৃথিবীকে দেখার, জানার এবং পুরোপুরি বুঝে নেওয়ার পরিমেয় সময় হিসেবে।

মানিকের জন্ম মে ১৯,১৯০৮। ২০০৮ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ।

পৃ থি বী র পা ঠ শা লা

জীবনদর্শনের পাঠশালায় এসে নবজীবনের ব্রতচর্যা নিয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মৃত্যু তাঁর কাছে শ্যামসুন্দর বলে প্রতিভাত হয়নি। বরং জীবনের নিকষিত হেম-এর সন্ধানে তিনি অবলীলায় নেমে গিয়েছিলেন জনতার হাটের মাঝখানে। মানুষের শ্রম-ঘাম-রক্ত-অশ্রুর রসায়ন তিনি নিবিড় দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সেই জীবনকে সমস্ত বৈচিত্রসহ ছেঁকে তুলে এনেছেন তাঁর গল্প - উপন্যাসের অক্ষর - বিধৃত পৃষ্ঠায়। মজুরদের মিছিলে তিনি নির্দ্বিধায় হেঁটেছেন, রাস্তায় ছাত্রদের আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন, পথচারীর কাছে তাঁদের এলাকার খবরাখবর নিয়েছেন আগ্রহের অতিশয্য নিয়ে, আবার কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরে উত্তপ্ত আলোচনায় অংশও নিয়েছেন। জীবনকে বাদ দিয়ে সংগ্রাম এবং সংগ্রাম বিবর্জিত জীবন তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছাড়পত্র পায়নি কোনদিন।

নৌবিদ্রোহ, রসিদ আলি দিবস বা উনতিরিশে জুলাইয়ের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে মানিক ক্লান্তিহীনতার সঙ্গেই জীবনের অমূল্যধন সন্ধান করেছেন। রক্তপতাকার হাতছানির মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের মুক্তির কাঙ্খিত নিশানা। শিল্পীজীবনের প্রাথমিক দিগ্‌দর্শন তাই তিনি বর্জন করে, অবলীলায় চলে এসেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ব্রতচর্যায়। সংগ্রামমুখর জীবনের কল্লোলিত স্বপ্নের ভেতর তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এক নতুন দিগ্‌দর্শন।

দর্শনবৈভবে এহেন ঋদ্ধ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তবু ধীর পায়ে নিঃশব্দে - নীরবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেকি আত্মসমর্পনের জন্য নাকি বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তিনি?

সা হি ত্য ক রা র আ গে

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনার-এ একবার ডাক পড়েছিল তিনজন সাহিত্যসেবীর। একজন হলেন গোপাল হালদার, দ্বিতীয় জন মনোজ বসু এবং তৃতীয় জন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সেমিনার-এ মনোজ বসু বলেছিলেন ঃ গল্প হচ্ছে বানানো কথা, সবটাই উদ্‌ভাবনা, মিথ্যা। মানিক এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন ঃ 'যা হয়, যা দেখি, তাই লিখি। যা নয়, যা মিথ্যা, যা দেখিনা জানিনা, সাধ্য কি তা লিখব? মনোজ বসুর কথা নয়, মানিকের বক্তব্যেই প্রভাবিত হয়েছিলেন ছাত্ররা।

মানিকের বক্তব্য এখানে পরিষ্কার ঃ নিথ্যার সঙ্গে সাহিত্য সৃজনের কোন সম্পর্ক নেই। বাস্তব তথ্যই সাহিত্যের উপাদান হয়ে ওঠে। তবে নিছক ফোটোগ্রাফি নয়, এই বস্তুনিষ্ঠ উপাদানকে কাজে লাগাতে হবে, ব্যবহার করতে হবে শিল্পসম্মতভাবে। তাঁর সাহিত্য করার আগে শীর্ষক নিবন্ধে মানিক লিখেছেন ঃ

যে জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই
জীবনটাই সাহিত্যে কিভাবে কতখানি রূপায়িত
হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে
জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে সৃষ্টির প্রেরণাও
জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এসেছিল এক বিখ্যাত পুতুল নাচের দল। সেই পুতুলনাচের দলের সান্নিধ্যে এসে তিনি খুঁজে পান লেখার উপকরণ। লেখেন 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে দাদার পাত্রী দেখার জন্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কিছু দিন অতিবাহিত করেন। বিয়ের পর সবাই চলে এলেও মানিক কিছুকাল থেকে যান। বাস করেন পদ্মার মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে। সান্নিধ্যের নৈকট্যে থেকে তিনি দেখেন তাদের জীবনচর্যা, জীবনাচরণ। তারপর লেখেন 'পদ্মানদীর মাঝি'। এর আগে পূর্ববঙ্গে তাঁর এক পরিচিত বাঁশি - বাজিয়ে ও তাঁর স্ত্রী-র জীবন নিয়ে লিখেছিলেন 'অতসী - মামি'। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নিছক কল্পনাবিলাস নয়, বাস্তব জীবনের তন্নিষ্ঠ চিত্র - চরিত্র থেকে তিনি তাঁর লেখার উপকরণ সংগ্রহ করতে ব্রতী হয়েছিলেন গোড়া থেকেই। মার্কসবাদের দর্শনবৈভবে তখনও তিনি নতুন জীবনদর্শনের পরিক্ষেত্রে আসেননি। কিন্তু তাঁর অভিগমনের পর্যায়িকতা দুর্নিরীক্ষ্য থাকেনি।

সমসময়ে কমিউনিস্ট বিরোধী গল্পরচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বনফুল-সুবোধ ঘোষ-রা এব্যাপারে সক্রিয় অনুশীলনে ব্রতী হয়েছিলেন। এই কমিউনিস্ট বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষাত্মক গল্প এসময় লেখেন মানিক। মানিকের এ-হেন গল্প চিন্মোহন সেহানবিশ - কে চমৎকৃত করেছিল। এরপর মানিক তাঁর 'প্রতিবিম্ব' -এ কয়েজন কমিউনিস্ট -এর চরিত্রাঙ্কনে প্রয়াসী হন। তখনও তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেননি। উত্তরকালে চিন্মোহন সেহানবিশের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে মানিক অকপট স্বীকারোক্তিতে বলেছিলেন যে 'প্রতিবিম্ব' দাঁড়ায়নি কারণ তখনও পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। তবে তিনি সেসময় চিন্মোহন সেহানবিশকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে যখন তিনি কমিউনিস্টদের ঠিকমতো চিনবেন তখনই সার্থক গল্প লিখতে সমর্থ হবেন। মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার পরবর্তীতে মানিক স্বীকার করেছেন ঃ

আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি থাকে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানাবার সাধ্য হয়নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি....।

মানিক আরও স্বীকার করেছেন যে সমাজ - জীবনে ভাববাদ আর বস্তুবাদের মধ্যে যে প্রকট সংঘাত সাহিত্যের অঙ্কন সৌষ্ঠবে প্রতিফলিত হয়েছে - তা মার্কসবাদের মাধ্যমেই তিনি চিনতে, জানতে এবং আত্মস্থ করতে শিখেছেন।

দ্রোহময় দিনগুলি

লেখার নেশায় মানিক প্রথাগত শিক্ষার পাট চুকিয়ে দিয়েছিলেন কোনরকম দ্বিধা ব্যতিরেকেই। সৃজনশীল রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য তাঁকে রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী, স্বক্ষমতাসচেতন করে তুলেছিল। তাঁর দাদাকে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির লেখকদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেবেন।

লেখার সনিষ্ঠ তথ্য আহরণের ক্লান্তিকর পর্যায়িকতায় শারীরিক পরিশ্রম তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। পারিবারিক অসহযোগিতা এব নিঃসীম দারিদ্র্য তাঁর অসুস্থতাকে সর্বাত্মক করে তোলে। ডাক্তার বিধান রায়ের পরামর্শে মানসিক সুস্থিতির লক্ষ্যে মানিকের বিবাহ দেওয়া হয়। সময়টা ছিল ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষাশেষি। একসময় তিনি 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহকারি সম্পাদকের পদে বৃত। কিন্তু ১৯৩৯ -এর ১ জানুয়ারি থেকে এই চাকরি তিনি ছেড়ে দেন। চাকরি ছাড়ার কারণ হিসেবে তিনি অবশ্য দু'বছরে মাইনের বৃদ্ধিহীনতা, দশ-বারো ঘন্টা পরিশ্রম এবং এখানে কোন ভবিষ্যৎহীনতার কথা দাদাকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা তাঁর মতে, একটি 'লুজিং কনসার্ন এবং এর পরিচালন ব্যবস্থাও খুব খারাপ বলে অভিযোগ করেছিলেন মানিক। মানিকের এই বক্তব্য অযথার্থ না হলেও, চাকরি ছাড়া আর একটা বড়ো এবং প্রধান কারণ তিনি উল্লেখ করেননি। 'বঙ্গশ্রী'র সত্ত্বাধিকারী শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মতান্তর-ই মানিকের চাকরি ছাড়ার প্রধান এবং একটা বড়ো কারণ। মানিকের সঙ্গে সচ্চিদানন্দের সম্পর্ক আদতে সুবহ ছিল না। এই সচ্চিদানন্দের সঙ্গে মতান্তরজনিত কারণে 'বঙ্গশ্রী'র সংস্পর্শ ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস-ও।

জীবন দর্শনের নতুন পাঠ

কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে মানিক নতুন জীবনদর্শনের অধিকারী হয়েছিলেন, নতুন বিশ্ববীক্ষায় প্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর সৃজনশীল গল্প - উপন্যাসে তাঁর মার্কসীয় দর্শনজনিত বোধ ও বোধি নতুন মাত্রায় বিভূষিত হয়েছিল। সংগ্রামের ময়দানে নেমে পিছিয়ে যেতে তিনি ছিলেন একান্তই অনীহ। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পে পিতৃহৃদয়ের যে স্নেহপ্রবণতা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কীর্তিত হয়েছে, মানিকের চোখে তা প্রশ্নাকুল হয়েছে। তিনি জেনেছেন যে কাবুলিওয়ালা জোঁকের মতোন শোষণে অভ্যস্ত, শোষক - চারিত্যই কাবুলিওয়ালার মধ্যে প্রতিভাত। অথচ রবীন্দ্রনাথ কাবুলিওয়ালার ওই কদর্য চরিত্র আড়াল করে তার মধ্যে পিতৃহৃদয়ের স্নেহপ্রবণতার দিকটিকেই উদ্‌ঘটিত করতে চেয়েছেন। কত শত স্নেহপ্রবণ পিতাকে সে জোঁকের মতোন শোষণ করেছে - সে তথ্য রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ল না! মানিকের ওই শাণিত প্রশ্ন রবীন্দ্রনুরাগীর কাছে অস্তস্তিকর ঠেকলেও তার যাথার্থ্য ও যৌক্তিকতা মান্যতা পায়।

মানিক শৈলজানন্দের কয়লাকুঠিতে গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনি শ্রমিকের জীবনের সরলরৈখিক চিত্রাঙ্কনের ভেতর নিছক ছবি-ই খুঁজে পেয়েছিলেন। এখানে বস্তি এসেছে কিন্তু বস্তিজীবনের নগ্ন বাস্তবতা অনুপস্থিত। বস্তির মানুষ আর পরিবেশ নিয়ে একটা মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিক আবেগ ছাড়া মানিক আর কিছু খুঁজে পাননি। ১৯৩৩ বঙ্গাব্দের 'কালিকলম' পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনের পাঠ নেবার জন্য ন্যুট হামসুন আর ম্যাক্সিম গোর্কিকে একাকার করে ফেলেছিলেন। এতে করে বিব্রত মানিক প্রশ্ন তুলেছিলেন ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র হামসুন আর গোর্কিকে কি করে মেলাচ্ছেন! তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যঃ 'ভাবের আকাশে ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?'

শৈলজা - প্রেমেন্দ্ররা মার্কসবাদী শিবিরের লেখক ছিলেন না। মার্কসবাদী মানিকের চোখে তাই তাঁদের জীবনদর্শন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নাতীত গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কিন্তু মার্কসবাদী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত লেখক - কবিদের দর্শনজনিত দারিদ্র্যও মানিককে পীড়িত করেছিল, ক্ষুব্ধ করেছিল, আক্রমণমুখী করে তুলেছিল। বিষ্ণু দে'র মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, নির্দ্বিধায় বলেছিলেনঃ

সংগ্রামী বাঙালির সংস্কৃতির লাল রাস্তা তৈরী করতে হলে সংগ্রামী সমালোচনা ছাড়া চলবে কেন? পুরানো সংস্কৃতি ধাঁধাঁকে সাদরে বজায় রেখে নতুন সংস্কৃতি গড়া যায় না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাহিত্য - কৃতির সমালোচনা প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে বলেছিলেন যে অচিন্ত্যকুমার হাকিম কিনা কিংবা তিনি কৃষক সভার রিপোর্ট থেকে গল্প লেখেন কিনা - এসব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, এসব জানানোর কোনো আবশ্যিক শর্তও নেই। মানিকের আপত্তি এখানেই। তাঁর মতে লেখককে বাদ দিয়ে লেখার বিচার কি সম্ভব? লেখক কি আকাশ থেকে পড়ে? লেখককে না জানালে লেখাকে কিভাবে বোঝা সম্ভব? মানিকের অভিযোগ ঃ বিষ্ণু দে এখানে ঘুরপথে কলাকৈবল্যবাদের পক্ষে ওকালতি করেছেন, মার্কসবাদের মূলকথাকে 'উড়িয়ে' দিয়েছেন। মানিকের স্পষ্ট বক্তব্য ঃ প্রগতিশীল সমালোচনা কোন লেখককে ছেড়ে কথা বলে না, তা সেই লেখক কলকাতায় বসে 'গায়েন' লিখুন, হাকিমের আসনে বসে 'মুচিবায়েন' লিখুন আর 'মার্কসবাদ নিয়ে' ঘরে বসে কাব্যরচনা করুন।

অন্ধকারের আগের কথা - ১

এহেন কমিউনিস্ট কর্মী-সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রিয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছিলেন। পার্টির

লেখক - বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র দলাদলি মানিককে ক্ষুব্ধ, বোবা করেছিল। নরহরি কবিরাজের বাড়িতে আহূত সভায় আহ্বায়ক মানিককে ডাকেননি, গোলাম কুদ্দুস এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সভায় অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র রবীন্দ্র গুপ্তের সমসময়ের সাড়া জাগানো প্রবন্ধ 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'র জবাব দেন। তাঁর বক্তৃতার 'ঝাঁঝ' 'রাগ' ও 'গালাগালি' বাস্তবিক মানিককে বিস্মিত করেছিল। অমরেন্দ্রবাবু সেদিন মানিককে অপবাদসূচক কথা বলতেও দ্বিধা করেননি। ওই ঘটনা ঘটে জু ৫,১৯৫০ তারিখে। এর আগের দিনও অমরেন্দ্রবাবু মানিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। মানিককে 'বর্জনের ভয় দেখিয়ে' তাঁর অনুগত করার অপপ্রয়াস পেয়েছিলেন নরহরি কবিরাজ। তিনি ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ও মানিককে এড়িয়ে চলতেন। ননী ভৌমিক, গোপাল হালদাররাও মানিককে অপদস্ত করার চেষ্টায় চেষ্টিত হয়েছিলেন - এসব তথ্য পাওয়া যায় মানিকের ডায়েরির পাতায়।

মানিকের অসুস্থতার সময়েও 'পার্টির কবি - লেখকরা পর্যন্ত' তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না আসায় তিনি হতাশ হয়েছিলেন। এঁরা আসেননি, এমনটি নয়, হয়তো নিয়মিত আসেননি - যেটা মানিক আশা করেছিলেন। নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আর একজন অ-কমিউনিস্ট লেখক ওই অবস্থায় মানিককে যথাযথ সাহায্য - সহযোগিতা করেছিলেন, বারবার তাঁকে দেখতে এসেছিলেন - তিনি হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্ধকারের আগের কথা - ১

পার্টির লেখক - বুদ্ধিজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের তরফে মানিকের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল, তার যথার্থ কারণ কি? ১৯৪৯ -এক সেপ্টেম্বর মাসের 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে পার্টির নেতা ভবানী সেনের 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক যে আলোড়ন - সৃষ্টিকারী প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তা সমসময়ে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী - লেখক মহলে তীব্র বিতর্কের জন্ম নেয়। পার্টির মধ্যেকার দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের প্রতিক্রিয়ার অতিবামপন্থার জন্ম হয়। ভবানী সেন সেই সময়ে অতিবামমার্গী রণদিভে লাইনের প্রবক্তা ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর লেখার বক্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করে। কিছু বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রবীন্দ্র গুপ্তের লেখার বক্তব্যের প্রতি মানিকের খানিকটা পক্ষপাতিত্ব থেকে গিয়েছিল। এটাই কি মানিকের অপরাধ? এজন্যই কি মানিককে পার্টির লেখক বুদ্ধিজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের কাছে বারবার অপদস্ত হতে হয়েছিল?

ওষ্ঠপুটে মৃত মৌমাছি?

মানিক হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তীব্র দারিদ্র্য, অসুস্থতা, নিরাময়হীনতা তাঁকে হতাশ করেছিল। পার্টির সহযোদ্ধা লেখকদের দুর্ব্যবহার তাঁকে হতাশ করেছিল। পার্টির মধ্যেকার সুবিধাবাদ, দুর্বিনীত আচরণ আমলাতান্ত্রিকতা তাঁকে হতাশ করছিল। পার্টিকমীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন এবং যথার্থ মার্কসবাদ অনুশীলনের মধ্যেকার আকাশ - পাতাল ফারাক এবং বিপ্রতীপতা তাঁকে হতাশ করছিল। পার্টিকর্মীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন এবং যথার্থ মার্কসবাদ অনুশীলনের মধ্যেকার আকাশ - পাতাল ফারাক এবং বিপ্রতীপতা তাঁকে হতাশ করছিল। নির্বাচনে পার্টির অংশগ্রহণ, অন্ধ্রের সরকার গঠনের ব্যাপারে 'সগর্ব ঘোষণা' সত্ত্বেও নির্বাচনে একশ উনচল্লিশটি আসনের মধ্যে মাত্র সাতটি আসন লাভের মর্মান্তিক বাস্তব ঘটনা মানিককে যারপরনাই হতাশ করেছিল। তিনি সোজাসাপ্টা বলেই দিয়েছিলেন "The CPI dose not understand the mind of India" পার্টির 'ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তিনি শুধুমাত্র নেতৃত্বকে দায়ী করেননি, তাঁর মতে দায়ী পার্টি-সদস্যরাও ঃ 'নেতৃত্ব দোষী- গুরুতররূপে দোষী। কিন্তু সভ্যরাও দোষী।'

এইসব ঘটনা পরম্পরা মানিককে হতাশ করেছিল। তিনি কি মৃত্যুকে আবাহন করে ওই হতাশা থেকে মুক্তি চাইছিলেন? নেশাগ্রস্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি কি মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেলেন? 'চাঁদা তুলে', 'সব কীট' মেরে সুকান্তকে বাঁচানোর শপথ নেওয়া সত্ত্বেও সুকান্তকে মানিকরা বাঁচাতে পারেননি। এই হতাশা কি মানকিকে নিরন্তর দগ্ধ করছিল? নিজের অসুস্থতা এবং তার ক্রমনিরাময়হীনতা কি তাঁকে কবি সুকান্তর অবধারিত ভবিতব্যের সঙ্গে একাসনে বসাচ্ছিল? মানিক কি জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন? তিনি কি বুঝে গিয়েছিলেন তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না? তিনিও কি নিঃশব্দ মৃত্যুর শীতল হাতছানির কাছে আত্মসমর্পন করতে চাইছিলেন? মানিক শেষ পর্যন্ত 'মায়ের দয়ার' ওপর বিশাস স্থাপন করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, মার্চ ৪, ১৯৫৫-র ডায়েরির পৃষ্ঠা)। বিশ্বাস করছিলেন 'মায়ের দয়ায় মৃতও জীবন পায়।' তিনি 'মৃত' হওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন জীবনপ্রাপ্তির প্রত্যাশী হয়েছিলেন? মানিক কি শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদে আস্থা হারাচ্ছিলেন?

সব প্রশ্ন উত্তরের প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে না। সব উত্তরও সবসময় প্রশ্নকে অবসৃত করে না। তবে সাম্প্রতিককালে সিঙ্গুর - নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে আবার সলেখনী মূর্ত হয়ে উঠেছেন। হয়ে উঠেছেন অপ্রতিরোধ্য।

লাল পতাকার অধিকার

তাঁর 'চিহ্ন' উপন্যাসে মানিক এক ছাত্রের কথা লিখেছিলেন। মিছিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে শুধু বলেছিল ঃ 'ওরা আর এগোচ্ছে না কেন? ওরা কি আর এগোবে না?'

বেঁচে থাকলে মানিক দেখতেন সরকারি মার্কসবাদীদের মিছিল আজ আর এগোয় না, তারা না এগোতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে মিছিল এগোয়, থামে না - তাকে এরা গুলি করে থামিয়ে দিতে চায়।

তবু হারানের নাতজামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রীরা আজ মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে নতুন করে লাল পতাকার স্বপ্ন দেখতে চাইছেন। পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের দালালদের হাত থেকে লাল পতাকার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছেন।